

# মুসলিম প্যারেন্টিং

— সন্তান প্রতিপালন গাইড —

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

# সূচিপত্র

## প্রথম পর্ব শৈশবের লালন-পালন

|   |    |
|---|----|
| আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত                       | ১৭ |
| সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ                  | ১৭ |
| এক বিরাট দায়িত্ব                             | ১৮ |
| কথার চেয়ে কাজ কঠিন                           | ১৯ |
| আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা                        | ২০ |
| সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব           | ২১ |
| ইতিবাচক প্যারেন্টিং; একটি সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টা | ২৩ |
| দুর্বল প্যারেন্টিং-এর কারণ                    | ২৪ |
| মহৎ কিছুর প্রস্তুতি                           | ২৭ |
| প্যারেন্টহুড-এর প্রস্তুতি                     | ২৯ |
| বিয়ে, পরিবার ও প্যারেন্টহুড                  | ২৯ |
| পরিবার পরিকল্পনা                              | ৩১ |
| নবাগত সদস্য                                   | ৩২ |
| শিশুর জন্মলগ্নে ইসলামি রীতি                   | ৩৩ |
| সহোদরদের মধ্যে সমতা                           | ৩৫ |
| নবাগত শিশুর যত্ন                              | ৩৬ |
| পিতা-মাতার ওপর সন্তানের অধিকার                | ৩৮ |
| শিশুর সাথে আস্থাपूर्ण সম্পর্ক তৈরি            | ৩৯ |

|   |    |
|---|----|
| শৈশবকাল এবং স্কুলপূর্ববর্তী সময়              | ৪১ |
| টোডলার (Toddler)                              | ৪১ |
| প্যারেন্টিং পদ্ধতি                            | ৪৩ |
| আত্মগঠনের সময়                                | ৪৬ |
| ভারসাম্যপূর্ণভাবে বেড়ে উঠার জন্য যা প্রয়োজন | ৫০ |
| স্কুলপূর্ব সময়ে চাইল্ডকেয়ারে রাখা           | ৬১ |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলো | ৬৩ |
| প্রাথমিক স্কুল বাছাই         | ৬৩ |
| স্কুলজীবনের শুরু             | ৬৪ |
| প্রাইমারি স্কুলে কিছু সমস্যা | ৬৫ |
| পড়ার গুরুত্ব                | ৭১ |
| অভিভাবক-স্কুল পার্টনারশিপ    | ৭১ |

|   |    |
|---|----|
| পারিবারিক পরিবেশ                          | ৭৩ |
| শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিবারের কর্তব্য     | ৭৪ |
| ব্যক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিবার | ৭৫ |
| সন্তানদের সাথে অর্থবহ সময় কাটানো         | ৭৬ |
| ইসলামিক আদব                               | ৭৮ |
| শ্রবণের নীতিমালা                          | ৮৩ |
| সংযম                                      | ৮৪ |
| কঠিন আচরণের মোকাবিলা                      | ৮৫ |
| সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা                       | ৮৬ |
| হালাল ও হারাম                             | ৮৭ |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| মুসলিম চরিত্র গঠন                     | ৮৮ |
| ইসলামি শিক্ষা; সামগ্রিক পদক্ষেপ       | ৮৮ |
| মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য | ৯০ |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| সাপ্লিমেন্টারি ইসলামিক স্কুল | ৯৪ |
| মুসলিম সংস্কৃতি তৈরি         | ৯৫ |
| উপসংহার                      | ৯৯ |

## দ্বিতীয় পর্ব কৈশোরের পরিচর্যা

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ               | ১০৭ |
| দিবাস্বপ্ন নাকি দুঃসাহসিকতা          | ১০৭ |
| বিরোট পরিবর্তন                       | ১০৮ |
| অন্যান্য বিষয়                       | ১১২ |
| ব্যক্তিগত দুর্বলতার ব্যাপারে সচেতনতা | ১১৯ |
| কঠিন বিষয় মোকাবিলা করার উপায়       | ১২৫ |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| সামাজিক অসুস্থতার প্রবল আক্রমণ | ১৩১ |
| ব্যাধির প্রসার                 | ১৩১ |
| ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম       | ১৪০ |

|  |     |
|--|-----|
| শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রেরণা             | ১৪৩ |
| মানবজাতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | ১৪৩ |
| আত্মমর্যাদাবোধ                         | ১৪৫ |
| উৎসাহ                                  | ১৪৭ |
| অনুকরণীয় আদর্শ                        | ১৪৮ |
| ভারসাম্যপূর্ণ লালন-পালন                | ১৪৯ |
| প্রকৃত সফলতার দীক্ষা                   | ১৫০ |
| পর্যায়ক্রমিক উন্নতি                   | ১৫১ |
| ব্যর্থতার মোকাবিলা                     | ১৫২ |
| কিশোর মননে উৎসাহদান                    | ১৫৩ |

|  |            |
|--|------------|
| <b>পারিবারিক পরিবেশ</b>                | <b>১৫৭</b> |
| পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্ব             | ১৫৭        |
| পরিবারই কিশোরদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি | ১৫৮        |
| সন্তানদের সার্থক সময় দান              | ১৬০        |
| একটি মুসলিম যুব-সংস্কৃতি তৈরি          | ১৬১        |
| গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ                   | ১৬৩        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলো</b>   | <b>১৬৫</b> |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন           | ১৬৫        |
| জীবনের সঠিক ভিত্তি স্থাপনের প্রস্তুতি | ১৬৯        |
| অন্যান্য চ্যালেঞ্জ                    | ১৭৬        |
| আত্মপরিচয়                            | ১৮৪        |
| আনন্দ-উল্লাসের কৃষ্ণবহর               | ১৮৬        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>দায়িত্ববোধের জগতে</b>             | <b>১৮৮</b> |
| অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক              | ১৮৮        |
| ক্যারিয়ার বাছাইসংক্রান্ত পরামর্শ     | ১৮৯        |
| বিশ্ববিদ্যালয়; জ্ঞান অর্জনের রাজতোরণ | ১৯১        |
| দাওয়াতি কাজের সুযোগ                  | ১৯২        |
| ইসলাম ও খিদমাহ                        | ১৯৩        |
| জীবনচক্র                              | ১৯৪        |
| প্যারেন্টিং কি সফল হয়েছে             | ১৯৫        |
| উপসংহার                               | ১৯৭        |



প্রথম পর্ব

# শৈশবের লালন-পালন



## আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

‘ওহে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালঙ্ঘন করো না।’—সূরা আনফাল : ২৭

### সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি আমানতস্বরূপ। অন্যকথায়, সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পিতা-মাতার ওপর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশনাও দিয়েছেন যথোপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আমানতের খেয়ানত করার অর্থ হলো—আল্লাহর দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা। আমরা যদি নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি সম্পাদন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করি, তবে সর্বাত্মক সন্তান লালন-পালনের প্রকৃতি, এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য জীবনে কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা জ্ঞানবান মুসলিম মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। তবুও তাদের উপলব্ধিতে এই বিষয়টি থাকা উচিত—সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও জাগতিক সামগ্রীই যথেষ্ট নয়; বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলাও আবশ্যিক। যাতে তারা সমাজের একজন ভালো মানুষ ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন পদ্ধতি মূলত তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে মঙ্গলজনক বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যা পিতা-মাতার দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ এবং পরকালীন জীবনে ভালো ফলাফল অর্জন নির্ভর করে সন্তান প্রতিপালনে সফল হওয়ার ওপর।

বান্দা পরকালে নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত অবস্থায় দেখে বলবে—

‘হে আল্লাহ! আমি এই মর্যাদার অধিকারী কীভাবে হলাম?’ আল্লাহ বলবেন—‘মৃত্যুর পর তোমার সন্তানরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, সে কারণে তুমি এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছ।’

আহমাদ ও ইবনে মাজাহ

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার যেমন বিশাল, তেমনি এর ব্যর্থতার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। একজন শিশুর যত্নের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার, বিশেষত মাতার শারীরিক উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান বড়ো হওয়ার সাথে সাথে পিতা-মাতার মাঝে শিক্ষা বাড়তে থাকে; তার স্বাস্থ্য, পড়াশোনা ও বিভিন্ন সামাজিক বৈরী পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সক্ষমতা নিয়ে। এই শিক্ষা বা উদ্বোধন অমূলক নয়; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সচেতন পিতা-মাতার মনে রাখতে হবে, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই। তাই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পেরেশানি যেন আমাদের আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করতে না পারে, সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে হবে।

‘ওহে, যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে না সরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি তা করবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ সূরা মুনাফিকুন : ৯

একজন বিশ্বাসী নিজ সন্তানের থেকে প্রাপ্ত সকল পরিতুষ্টি ও দুঃখের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

### এক বিরাট দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালন মানে কেবল পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্ব নয়। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব শুধু শারীরিক প্রক্রিয়ার ফলাফল, কিন্তু সন্তান প্রতিপালন হচ্ছে জীবন প্রক্রিয়ার একটি সচেতন কার্যক্রম। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া—যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আরেকজন নবাগত অপরিপক্ব মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যা এবং তার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা প্রয়োজন। কারণ, প্রত্যেক অভিভাবককে একই সঙ্গে একজন শিক্ষক, পরামর্শক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পিতা-মাতাও মানুষ, প্রকৃতিগত কারণে তাঁদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো পিতা-মাতাই সন্তান প্রতিপালনে শতভাগ সফল হতে পারে না। আর সন্তান প্রতিপালনের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কোনো পিতা-মাতাই বিচার দিবসে পাকড়াও হবে না। তথাপি পিতা-মাতাকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, তাদের ভঙ্গুর কাঁধে অর্পিত হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রতিপালনের ভারী বোঝা।

পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর ভেতর আরেকটি ক্ষুদ্র পৃথিবী; যেখানে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব পালন এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আপস, সম্মানসহ বিভিন্ন মানবিক বৈশিষ্ট্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।



## প্যারেন্টহুড-এর প্রস্তুতি

‘আল্লাহ তাঁর দয়া-মায়ার শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে বাকি এক ভাগ পৃথিবীর সকলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিকূল একে অন্যের প্রতি দয়াশীল। এমনকী ঘোড়া তার শাবক থেকে নিজের খুর দূরে রাখে সন্তান পিষ্ট হয়ে যায় কি না এই ভয়ে।’

### বিয়ে, পরিবার ও প্যারেন্টহুড

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের প্রথম ধাপ হলো বিয়ে। বিয়ে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে আনন্দ, প্রশান্তি ও প্রবোধ জোগায়। এটি দুজনকে একই ছাদের নিচে বসবাস করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আপস-মীমাংসা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। মানুষ যে ধরনের ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায়, তার ওপরই নির্ভর করে সন্তান কেমন হবে।

‘সত্যশ্রয়ী, সৎ ও বিশ্বাসী নারী-পুরুষ তাদের চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিকেই জীবনসঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চায়। অপরদিকে অসৎ সঙ্গীরা প্রাকৃতিকভাবে একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।’ সূরা নুর : ২৬

বিয়ে হলো দুটি মানুষ ও পরিবারের মাঝে জীবনব্যাপী এক প্রতিশ্রুতি। এটিকে খুঁটিও বলা চলে, যার ওপর ভিত্তি করে লালিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সুতরাং এই বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া খুবই জরুরি। একটি বৈবাহিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নেয়ামক হিসেবে কাজ করে—

- ভালোবাসা ও দয়া
- সম্মান ও স্নেহ
- দৃঢ়তা ও ক্ষমাশীলতা
- ন্যায়বিচার ও সমতা
- সততা ও আন্তরিকতা
- খোলা মন ও স্বচ্ছতা

- পারস্পরিক পরামর্শ
- বিশ্বস্ততা
- ত্যাগ-তিতিক্ষা
- কঠোর পরিশ্রম এবং ছাড় দেওয়ার মনোভাব।

যখন কোনো পরিবারে এসব গুণাবলির সম্মিলন ঘটে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুত হয়, তখন সেখানে একটি আদর্শিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়—যা সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য খুবই সহায়ক।

পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব একই সঙ্গে অনন্য ও দুঃসাহসিক। এই দুঃসাহসিক কর্ম সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হলো নিজের সক্ষমতা ও আল্লাহর ওপর ভরসা করা, কমনসেন্স কাজে লাগানো, খোলা মনের অধিকারী হওয়া এবং অধিক ধৈর্যশীল হওয়া। এই গুণগুলো একজন মানুষকে কঠিন দায়িত্ব পালনে এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে।

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল অনেক সমস্যার সমাধান বের করে আনে। তাই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের শুরু থেকে পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। নিজের ক্যারিয়ার, অর্থ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে সন্তান জন্মদানের কোনো উপযুক্ত সময় নেই। তাই এই বিষয়গুলোকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে সন্তান জন্মদানে অহেতুক বিলম্ব করা উচিত না। স্বামী-স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য হলো—সন্তান জন্মলাভের আগে ও পরে এমন পরিবেশ তৈরির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো, যা সন্তান প্রতিপালনের চ্যালেঞ্জকে কমিয়ে দেবে। এরপর আল্লাহর ওপর নির্ভর করা। তাওয়াক্কুল হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনার সমন্বয়।

‘যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন।’

সূরা আলে ইমরান : ১৫

## পরিবার পরিকল্পনা

গর্ভকালীন অবস্থা নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই রোমাঞ্চকর একটা সময়। এই মুহূর্তটা দম্পতিদের জন্য একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং ভয়ের কারণ। কেননা, প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানের নিরাপদ ও স্বাভাবিক জন্ম প্রত্যাশা করে। তারা এই সময়ে সন্তান জন্মের ব্যাপারে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মধ্যে থাকে ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অধ্যয়ন, জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ক্রয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা—যা সন্তান জন্মলাভের পর প্রয়োজন হতে পারে।

গর্ভাবস্থা এমন এক সময়, যার অভিজ্ঞতা কেবল নারীরাই পায়। শিশুকে গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে জন্মদান পর্যন্ত একজন নারীকে অনেক কষ্ট ও ব্যথা সহ্য করতে হয়। এ কারণেই ইসলামে বাবার থেকে মায়ের মর্যাদা বেশি। মূলত শিশুর জন্মলাভের পর থেকেই পিতা হিসেবে পুরুষের দায়িত্ব শুরু হয়। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভকালীন অবস্থা অনুভূত করার পর থেকেই অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই তার ত্যাগ-তিতিক্ষা শুরু হয়। গর্ভকালীন মুহূর্ত থেকেই একজন মা শরীরের যত্ন নেওয়া শুরু করে এবং জীবন ধারণের প্রকৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে।

এই সময়ে বিজ্ঞ পিতা-মাতারা নিজেদের মধ্যে ঠিক সেভাবে চরিত্র ও মূল্যবোধের সমাবেশ ঘটায়, যেভাবে তারা আপন সন্তানকে দেখতে চায়। এই সময়টি তারা কাজিফত চরিত্রের অনুশীলন এবং সন্তান প্রতিপালনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করার কাজে ব্যবহার করে। একটি শিশু যে পরিবেশে জন্মলাভ করে, তার একটা প্রভাব শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ওপর প্রতিফলিত হয়। যে শিশু এমন পিতা-মাতার কোলে জন্মলাভ করে—যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে শিশুর জীবন ওই শিশুর থেকে উত্তমভাবে শুরু হয়, যার পিতা-মাতা এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকে।

পিতা-মাতা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা, দান-খয়রাত, কুরআন অধ্যয়ন, নিয়মিত জিকির এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনার মতো কল্যাণকর কাজের প্রতি অভ্যস্ত হতে পারে, তবে তা কেবল আগত শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশই সৃষ্টি করবে না; বরং গর্ভে থাকা শিশুর জন্য বিরাট কল্যাণও বয়ে আনবে। একজন মা যা বলে, যা করে এবং যা চিন্তা করে, তা তার গর্ভে অবস্থিত ভ্রূণকে প্রভাবিত করে এবং তাকে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা এই সকল প্রস্তুতির পূর্বশর্ত।

### নবাগত সদস্য

যখন কোনো পরিবারে নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করত, তখন আয়িশা রা জিজ্ঞেস করতেন না সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে; বরং তিনি জিজ্ঞেস করতেন—

‘সে কি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ?’ যখন তাঁকে ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হতো, তখন তিনি বলতেন—‘সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার প্রতি।’ বুখারি

## পারিবারিক পরিবেশ

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন।’

—সূরা নাহল : ৮০

স্কুল হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র; যা মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে পরিবারই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নোঙর। যখন আমাদের চারপাশের পৃথিবী প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তখন পরিবার একটি বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল হওয়া উচিত; যেখানে শিশুরা পাবে নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশ। পরিবার এমন একটা স্থান হওয়া উচিত, যেখানে বড়োদের যত্ন ও ভালোবাসাই হবে তাদের সুখ ও আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। ঘরই হবে শিশুদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ। এটা বলতে কোনো দ্বিধা নেই—একটি সুস্থ, সুন্দর, বলিষ্ঠ সমাজ তৈরি করতে সুখী ও স্থিতিশীল পরিবারের বিকল্প নেই। এই ধরনের পরিবার এমন এক প্রতিষ্ঠানের ন্যায়, যেখানে এর হাল ধরার জন্য ভালো লিডার রয়েছে।

পরিবার এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত, যেখানে পিতা-মাতা ভালো কাজের ও নৈতিকতার নেতৃত্ব দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা মেসপালকের মতো, যারা একটা শিশু বড়ো হওয়ার আগ পর্যন্ত তার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করে। যে দায়িত্বের শুরু হয় শিশুদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে। এর উচ্চতম পর্যায় হলো মহামানবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার শিক্ষা দেওয়া।

ভালোভাবে দায়িত্ব পালননের জন্য পিতা-মাতা উভয়কেই স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। নিরাপদ ও বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল হওয়ার পাশাপাশি পরিবারকে শিশুর ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক উন্নতির বিষয়গুলোও শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

### শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিবারের কর্তব্য

আধুনিক স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সন্তানদের দুনিয়াবি সমৃদ্ধির জন্য নিজের মেধার সর্বোচ্চটা ব্যবহার করতে শেখায়। অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতিই এর মূল লক্ষ্য। সেখানে মানবীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে গৌণ ও ছোটো হিসেবে বিবেচনা করা হয়; অথচ কোনো মানুষ তার আত্মিক উন্নতি করা ছাড়া পরিপূর্ণ হতে পারে না।

‘সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোনো কাজে আসবে না; শুধু পবিত্র ও পাপমুক্ত আত্মা ছাড়া।’

সূরা আশ-শুআরা : ৮৮-৮৯

এটি এমন একধরনের শিক্ষা, যা পারিবারিক পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি এ রকম কোনো শিক্ষা নয়, যেটা সন্তানদের সপ্তাহে একদিন কোনো ইসলামিক স্কুল কিংবা মাদরাসায় পাঠানোর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যাবে; যদিও এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা রয়েছে। এ লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে সন্তানরা সহজে ইসলামিক জ্ঞানার্জন, বিশ্বাসের চর্চা এবং আমল করতে পারবে। এর অর্থ এই নয়, প্রত্যেক পিতা-মাতাকে ইসলামিক স্কলার হতে হবে। তবে তাদের অবশ্যই সন্তানদের শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং যারা ইসলামের গভীর জ্ঞান রাখেন, তাদের দ্বারা শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার মূল কারণই হলো জ্ঞান বা ইলম। প্রত্যেকটি ইসলামিক পরিবারে ছোটো পরিসরে হলেও একটি লাইব্রেরি থাকা উচিত, যেখানে ইসলামিক এবং অন্যান্য বিষয়ের বই থাকবে। পিতা-মাতাকে অবশ্যই সে সকল বইয়ের উৎসের বিশ্বস্ততা বা নির্ভরযোগ্যতার ওপর লক্ষ রাখতে হবে। আংশিক সঠিক কিংবা উগ্রবাদী মন-মানসিকতাপূর্ণ বই তাদের ইসলামের প্রতি দ্বিধায় ফেলতে পারে, যা সার্বিকভাবে তাদের ইসলাম থেকে দূরে রাখবে। যে সকল বই শিশুদের পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, সেগুলো নির্বাচন করতে হবে। বই নিতে হবে মূল উৎস থেকে—যা ইন্টারনেট, অডিও বা ভিডিও দ্বারা পুনঃস্থাপন করা যাবে না।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে—যা আমাদের ত্যাগী, বস্তুবাদহীন এবং সমাজের অন্য মানুষদের প্রতি বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভাবতে, তাঁর শোকর আদায় করতে এবং তাঁর রাহে মাখা নত করতে শেখায়। জাকাত উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে। রমজানের রোজার মাধ্যমে অনেক গুণাবলি অর্জন করা যায়। তাই আমাদের ইসলামের মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে থাকতে হবে আপসহীন।

একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিমের কখনোই শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে অলস বা গালগল্পের মধ্যে ডুবে থাকা উচিত নয়। ইসলাম আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান রেখেছে, যেখানে কিছু সূরা ও জিকির মুখস্থ করতে এবং মুখ দিয়ে তা জপতে হয়। এগুলো বাচ্চাদের ছোটো বয়সেই শেখাতে হবে। শিশুদের মধ্যে কোনো কিছু দ্রুত আয়ত্ত করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের বয়সে শিশুদের কুরআন মুখস্থ করা, সরল অনুবাদ এবং আরবি ভাষার সঠিক উচ্চারণ এবং আরবি ভাষা শেখার শ্রেষ্ঠ সময়। পিতা-মাতা হিসেবে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামি বিধান বাসায় মানার চেষ্টা করব এবং সন্তানদের বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তা শেখানোর চেষ্টা করব, বাকিটা নির্ভর করবে মহান আল্লাহর হাতে।

## ব্যক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে পরিবার

শিশুরা প্রাকৃতিকভাবে উদ্যমী ও চঞ্চল। তারা সব সময় ছোট্টাছুটির মধ্যে থাকে। তাদের এ বাধা-বিপত্তিহীন শারীরিক ও মানসিক চঞ্চলতাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পিতা-মাতার উচিত তাদের শারীরিক ও মানসিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা, যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে। তবে অবশ্যই তাদের সাধ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটা কেবলই শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য।

শিশুদের ঘরের বাইরেও একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিতে হবে, যেখানে তারা খেলাধুলা করবে এবং বিনোদন গ্রহণ করবে। এটা হতে পারে পার্কে হাঁটাচাঁটি করা, তাদের সাথে ফুটবল খেলা কিংবা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। এ ছাড়াও বই পড়ে, ছবি আঁকাআঁকির দ্বারা তাদের মানসিক কার্যক্রম উৎসাহিত করা যেতে পারে।

সন্তানকে পরিবারের একজন মূল্যবান সদস্য হিসেবে পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাকে পরিবারের কিছু ছোটোখাটো কাজও দিতে হবে। যেমন—

- তাদের নিজেদের রুমগুলো গুছিয়ে এবং পরিষ্কার করে রাখা
- খাবার গ্রহণের শেষে টেবিল পরিষ্কার রাখা
- তাদের অপরিষ্কার জামা-কাপড় নির্দিষ্ট স্থানে রাখা
- বাগান করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা
- স্কুলের বইপত্র ও ড্রেসের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া
- গাড়ি পরিষ্কারে সাহায্য করা
- সময়মতো হোমওয়ার্কগুলো সম্পাদন করা
- দাদা-দাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং
- বাবা-মায়ের গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করা।



দ্বিতীয় পর্ব  
কৈশোরের পরিচর্যা



## কিশোর বয়সের চ্যালেঞ্জ

‘আল্লাহ তাদের কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে সম্বোধন করেন এই কারণে যে, তারা তাদের পিতা-মাতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীল। পিতা-মাতার প্রতি ঋণী থাকার কারণে তাদের প্রতি যেভাবে তোমার দায়িত্ব রয়েছে, একইভাবে সন্তানদের প্রতিও তোমার দায়িত্ব রয়েছে।’

—আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারি

### দিবাস্বপ্ন নাকি দুঃসাহসিকতা

কিশোররা তাদের বেপরোয়া, আবেগপ্রবণ ও খামখেয়ালিপূর্ণ আচরণের কারণে সব সময় বড়োদের সমালোচনায় বিদ্ধ হয়। এর ইতিবাচক দিক হলো—এর মাধ্যমে তাদের সৃষ্টিশীলতা উদ্যোগ, জীবনশক্তি ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন একটি সময়, যখন মানুষ তার শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করে এবং দুঃসাহসিক কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করে।

এই সমস্ত শক্তি যদি আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইতিবাচক সামাজিক আচরণ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে এই গতিশীলতা সমাজকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়; কিন্তু পথভ্রষ্ট কৈশোর একটি ধংসাত্মক শক্তি, যা সমাজকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে এবং সমাজে বিরাট বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

ইসলামকে পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি যুগে তরুণরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা নিজের মানবিকতা, ভাবাবেগ, প্রাণশক্তি ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো মুহাম্মাদ বিন কাসিম। তিনি উমাইয়্যার শাসনামলে কিশোর বয়সেই দুঃসাহসিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

মুসলিম উম্মাহ যখন অতিমাত্রায় আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত হলো এবং মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে এলো, ঠিক তখনই শুরু হলো মুসলিম যুবশক্তির অচপয় ও অপব্যবহার। ফলে উম্মাহর পতনের সময় ঘনিয়ে এলো।

যুবকরা সেই নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে, যা তারা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের থেকে শেখে। তাদের আচার-আচরণ মূলত ছোট বয়সে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অভিভাবকদের উচিত কিশোর সন্তানদের



ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রাখা, যাতে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণার্থে তাদের একজন ভালো মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এর জন্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যা অতি উদারও নয়, আবার অতি রুঢ়ও নয়।

## বিরাট পরিবর্তন

পিতা-মাতা শিশুদের যে সমস্ত বিষয়াবলি শিক্ষা দেন, সেগুলোতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিশোররা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। শিশু যখন শৈশব থেকে কৈশোরের দিকে পদার্পণ করতে শুরু করে, তখন শারীরিকভাবে বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়; এমনকী তাদের আবেগ-অনুভূতিরও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ধরনের বেড়ে উঠা তাদের জীবনের এক বড়ো অভিজ্ঞতা, যা অনেকের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক আবার অনেকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।

জীবনে এই ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন কোনো সহজ বিষয় নয়; কিশোর হিসেবে বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। এই কারণে আনন্দায়ক বা চমৎকার ব্যাপারটাও তাদের কাছে হঠাৎ করে হতাশা কিংবা উদ্বেগে রূপান্তরিত হতে পারে। জীবনের এই পর্যায়ে পিতা-মাতাকে সন্তানদের জন্য নিজেদের আচার-আচরণের পরিবর্তন আনতে হয়। সন্তানকে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হয়। তাদের স্বতন্ত্র আচরণকে শুধু সহ্য করলেই চলে না; বরং এটিকে পূর্ণভাবে গ্রহণও করতে হয়। এই সময়েই মূলত অভিভাবকদের সন্তান লালন-পালনের সক্ষমতা যাচাই হয়।

অনেক অভিভাবক সন্তানদের এই নতুন আচরণে অনেক কষ্ট পান। অনেকে আবার শিথিলতা প্রদর্শন এবং কিশোর সন্তানদের বল্লাহীনভাবে ছেড়ে দেন। অন্যদিকে, অনমনীয় ও কর্তৃত্বশীল অভিভাবকগণ সন্তানদের ওপর নানা সীমারেখা আরোপ করেন। এগুলোর কোনোটিই শোভনীয় নয়। বিবেকবান পিতা-মাতা ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে সন্তানদের সাথে আচরণ করেন এবং তাদের আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে বিবেচনাপূর্বক নিজেদের মানিয়ে নেয়।

কৈশোর কখন শুরু হয়—তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। এটি দশ, ষোলো কিংবা আঠারো বছর বয়সে শুরু হতে পারে, তবে পুরো কৈশোরজুড়েই এর ব্যাপ্তি। জীবনের এই পর্যায়ে কী ঘটে? কৈশোর জীবন নিয়ে কোনটি মিথ আর কোনটি বাস্তবতা?

কৈশোর হলো শৈশবকালের পরিসমাপ্তির শুরু, যা তরুণদের দায়িত্ব নেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এই সময়টা যেহেতু তরুণদের মাঝে একধরনের মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলে, তাই অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের কার্যক্রমকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা। এই সময় সন্তানরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়।

**শারীরিক পরিবর্তন (Physical Changes) :** শারীরিক পরিবর্তন বা বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের সে সময়কে বলা হয়, যে সময়ে সন্তানদের শরীর ভিন্নমাত্রায় ভিন্ন উপায়ে কাজ করতে শুরু করে এবং যা তাদের শরীরকে সন্তান জন্মদানে সক্ষম করে তোলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে স্ত্রী হরমোনের

বৃদ্ধি তাদের শরীরকে একজন পরিপূর্ণ নারীর গঠনে রূপান্তরিত করে এবং তাদের মধ্যে হায়েজের (ঋতুস্রাব) সূত্রপাত ঘটে। শরীরে অধিক পরিমাণে টেস্টোস্টেরন (Testosterone) থাকার কারণে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের উচ্চতা ও ওজন অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তাদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয় এবং শরীরে বিভিন্ন স্থানে লোম গজায়। তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

এই সময়ে যেহেতু সন্তানদের মাঝে শারীরিক শক্তি ও কর্মচঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, এজন্য তাদের দরকার শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য মানসিক পুষ্টি।

শুধু সন্তানদের শারীরিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রাখলেই হবে না; বরং এই পরিবর্তনগুলোর সাথে তারা যেন সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারে, সেজন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সঙ্গে বয়ঃসন্ধিকালের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিয়ে যথাসম্ভব খোলামেলাভাবে আলোচনা করা। এর মধ্যে ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী ঋতুস্রাব ও স্বপ্নদোষের পর পবিত্রতা অর্জন, শরীরে অতিরিক্ত চুল পরিষ্কারসহ বিভিন্ন ইসলামিক আচার-ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই সকল ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা অপরিহার্য। তবে কোনো ধরনের ইতস্ততবোধ অভিভাবকদের যেন সন্তানদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত না রাখে।

স্বয়ং কুরআনেই এই সকল স্পর্শকাতর বিষয়ে শালীনভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যৌন ও যৌনতাবিষয়ক আলোচনা যেন কোনো ধরনের ট্যাবু হিসেবে গণ্য করা না হয়; বরং ইসলামিক উপায়ে যথাসম্ভব শালীনভাবে এই সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। যদি এসব ব্যাপারে কিশোরদের সঙ্গে আলোচনা করা না হয়, তাহলে তারা এই বিষয়ে অন্য কোনো নিকৃষ্ট উৎস থেকে তা শিখে নেবে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। তবে এই সকল বিষয়ে সাবলীল আলোচনার ক্ষেত্রে সন্তান ও অভিভাবকদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ ও গভীর সম্পর্ক অপরিহার্য।

## সামাজিক অসুস্থতার প্রবল আক্রমণ

‘শয়তান সুইয়ের মতো প্রবেশ করে এবং গাছের ন্যায় বিস্তৃতি লাভ করে।’—ইথিওপিয়ান প্রবাদ বাক্য

### ব্যাধির প্রসার

সুস্থতা নয়, অসুস্থতা অতি দ্রুত এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই ছড়ায়। অনুকূল পরিবেশে মহামারি রোগ যেভাবে ছড়ায়, অসচেতন ও অতি উদার পরিবেশে সামাজিক ব্যাধি এর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়ায়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই পরিবেশে নিজেকে ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে তা আরও জটিল। বয়ঃসন্ধিকালে পরিপক্বতা ও স্থিতিশীলতার ঘাটতি থাকে, তখনও জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে না এবং জীবনের প্রকৃত অর্থও যথাযথভাবে বুঝতে পারে না।

সন্তানদের চারপাশের পরিবেশের ব্যাপারে পিতাকে সচেতন থাকতে হবে, যাতে তাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে এবং জীবনের যে সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে। তরুণদের সাথে সম্পর্কিত আধুনিক সমাজের মূল সমস্যাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

**উদ্ভ্যক্ত (Bullying) ও হুমকি :** শুধু স্কুলেই নয়; কর্মক্ষেত্রেও উদ্ভ্যক্তের শিকার হওয়া খুব ব্যাপক একটি সমস্যা। ক্রমবর্ধমান ইসলামাতন্ত্র পরিবেশে কিশোরদের জন্য এটি মারাত্মক সমস্যা।

হেনস্তার শিকার ব্যক্তির ওপর এর মারাত্মক মানসিক প্রভাব রয়েছে, যা তার আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়। হেনস্তাকারী ব্যক্তির মধ্যে আত্মসম্মানবোধের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজেদের জীবনে তারা কোথাও না কোথাও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে জমে থাকা ক্রোধ ও হতাশা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। যে কেউ-ই হেনস্তার শিকার হতে পারে; বিশেষ করে একাকী ব্যক্তি, সামাজিকভাবে পরনির্ভরশীল মানুষ কিংবা সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা বেশি।

এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের মাঝে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করা। ছোটোকালেই সন্তানদের মাঝে আস্থা ও ভরসা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কারও দ্বারা হেনস্তার শিকার হলে পিতা-মাতাকে নিঃসংকোচে জানাতে পারে। অপরদিকে তাদের এটিও শিক্ষা দিতে হবে, সকল মানুষই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায় এবং ইসলামে পরস্পরকে হেনস্তার কোনো স্থান নেই। সূরা হুজুরাত : ১০

**সমাজবিরোধী আচরণ :** সকল ধরনের আত্মকেন্দ্রিক ও অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড কিংবা যা অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, মানুষের ওপর যার বিরূপ প্রভাব রয়েছে এবং যা সমাজ জীবনকে ধ্বংস করে দিতে পারে—এমন সমস্ত কর্মকাণ্ডই সমাজবিরোধী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর উৎপত্তি হয় উদাসীন পরিবারে। যেখানে দুর্বল পারিবারিক পরিবেশে সন্তান প্রতিপালন করা হয়। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্জনে জটিলতা, সমাজের ব্যর্থতা, মানসিক অসুস্থতা কিংবা প্রেরণার অভাব কিশোরদের মধ্যে সমাজবিরোধী কার্যক্রমের প্রবণতা তৈরি করতে পারে। সমাজবিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলো নিম্নরূপ—


১. খোলামেলা জায়গায় সকলের সামনে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ
২. পাড়ায় হইচই এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা
৩. জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করা, দেয়ালে অযথা ছবি কিংবা পোস্টার লাগানো
৪. রাস্তায় মাদকদ্রব্য কেনাবেচা করা
৫. ফুটপাথ বা রাস্তায় আবর্জনা ফেলা
৬. ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণ।

## দায়িত্ববোধের জগতে

‘বিচার দিবসে পাঁচটি বিষয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়া ছাড়া কোনো আদম সন্তান এক কদম নড়তে পারবে না। তার জীবন কীভাবে কাটিয়েছে, তার যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে, তার সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।’—তিরমিজি

### অভিভাবক সব সময়ই অভিভাবক

এটি চিরন্তন সত্য, সকল পিতা-মাতাই সন্তানদের নিয়ে অনেক বড়ো আশা করে এবং তারা নিজ জীবনে যা পায়নি, তা সন্তানদের দেওয়ার চেষ্টা করে। এই জন্যই তারা সন্তানের সবচেয়ে বড়ো অভিভাবক। এই অভিভাবকত্বের ছায়া থেকে সন্তানদের বের করে দেওয়া উচিত না; এমনকী তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলেও। নবি-রাসূল এবং মহান ব্যক্তিরাত্ত বয়ঃসন্ধিকালীন সময় পার হওয়ার পর সন্তানদের ছেড়ে দেননি; প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তাদের গাইড করেছেন। এটা ঠিক, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সকলকে অবশ্যই নিজ জীবনের দায়িত্ব নিতে হবে। তারপরও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে—যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন একে অপরকে ভালো পরামর্শ দেওয়া, গাইড করা। ইতিবাচক পারিবারিক পরিবেশে দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের কারণে বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে কখনো ইতস্তত বোধ করেন না। এই পরিবেশ মুসলিম সমাজকে আরও আন্তরিকতাপূর্ণ করে তোলে। এই পরিবেশেই অতীতে মানবিক মুসলিম সভ্যতা গড়তে ভূমিকা পালন করেছে। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের ভালোবাসা, লালন-পালন এবং জ্ঞান প্রদানের জন্য যথাযথ প্রতিদান পান, তখন বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিকভাবেই ভাবেন—তাদের খেয়াল রাখা হচ্ছে, পরিবারে তাদের মূল্যায়ন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে লোকমান -এর নিজ পুত্রের প্রতি উপদেশ বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি পুত্রকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করার উপদেশ দিয়েছিলেন (সূরা লোকমান : ১৩-১৯)।

একইভাবে ইবরাহিম ؑ যখন পুত্র ইসমাইল ؑ-এর স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অনীহা করতে দেখেন, তখন পুত্রকে উক্ত স্ত্রী ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী গ্রহণের পরামর্শ দেন। ইসমাইল ؑ দায়িত্বের সাথে তাঁর পিতার আদেশ পালন করেন। এই ঘটনাটি সহিহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ؓ কর্তৃক এক দীর্ঘ হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে।

আসমা বিনতে আবু বকর ؓ-এর মাতৃত্বপূর্ণ আচরণ ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ؓ-কে বারণ করেছিলেন অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পিছপা হতে। তিনি যখন শুনলেন, পুত্র আবদুল্লাহ আশঙ্কা করছেন—শাহাদাতের পর তাঁর শরীরকে বিকৃত করা হবে, তখন তিনি আবদুল্লাহকে অভয় দিয়ে বললেন—‘তোমার লাশের অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।’

এই সকল কাহিনি মুসলিম পিতা-মাতার ভূমিকার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন পিতা-মাতার স্বাভাবিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়; কিন্তু সন্তানদের প্রতি তাঁদের ব্যাকুলতা কখনো শেষ হয় না। ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের যে বীজ শৈশবে বপন করা হয়, তার ফলাফল পিতা-মাতা পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত ভোগ করেন। আল্লাহ সন্তানদের চোখে পিতা-মাতাকে সম্মানিত করেছেন। কারণ, তারা সন্তানদের জন্য সবকিছুই করেছেন। বিজ্ঞ পিতা-মাতা নিজের সম্মানজনক অবস্থানের অপব্যবহার করে সন্তানদের নিকট কখনো অন্যায় দাবি কিংবা তাদের জীবনে অহেতুক হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের কাজ হচ্ছে সন্তানদের যথাযথ উপদেশ দেওয়া, যা তাদের জন্য কল্যাণজনক। তারা এটি গ্রহণ করবে কি না—তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

### ক্যারিয়ার বাছাইসংক্রান্ত পরামর্শ

তরুণরা পরবর্তী শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ারসংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলকধাঁধার মধ্যে পড়েন। তাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া উচিত? কোন ধরনের ডিগ্রি অর্জন করা উচিত? কোন ধরনের পেশায় নিযুক্ত হওয়া উচিত? ইত্যাদি বিষয়ে তারা পেরেসান থাকে। সচেতন অভিভাবক সন্তানদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলসহ প্রাজ্ঞ লোকদের সাহায্য নিতে পারেন।

ষোলো বছরের পরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, লক্ষ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম আগ্রহী তরুণরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে পারে। অনেকেই আবার ভোকেশনাল কোর্সকে বাছাই করে—যেখানে পড়াশোনার চাপ কম লাগে, তবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক প্রায়োগিক দক্ষতা

অর্জন সম্ভব হয়। তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলো চয়েজ রয়েছে—স্কুল, কলেজ, ফুল টাইম, পার্ট-টাইম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। সুতরাং যারা নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়, তাদের সামনে অনেকগুলো অপশন থাকে— যেখান থেকে নিজেদের পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তারা যেকোনো একটিকে বাছাই করতে পারে। অপরদিকে যারা শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে— স্কুলজীবন শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

ষোলো বছরের পরে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সন্তানরা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে যখন জীবনের ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে শেখে, তখন থেকেই তারা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে শুরু করে। ছেলেমেয়েদের উদ্যোগ ও পছন্দের সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও তাল মেলানোর চেষ্টা চালায়। এই সময় পিতা-মাতা কিছুটা Relax Feel করেন। ভাবেন, তাদের দায়িত্ব মোটামুটি শেষ, এবার সন্তানরা নিজ থেকেই দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে উঠবে। কিন্তু এই সময়ে তরুণদের বাল্যহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাদের ঘুড়ির মতো উড়তে দিতে হবে, কিন্তু নাটাই রাখতে হবে নিজের হাতে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষের সফলতা দুই ধরনের। একটা হচ্ছে দুনিয়ার, আরেকটা আখিরাতের। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্মানজনক উপায়ে হালাল উপার্জন করাই দুনিয়ার সফলতার চাবিকাঠি। সফল পিতা-মাতা তারাই, যারা সন্তানদের মধ্যে এমন ঈমানের বীজ বপন করে দেন, যা হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর সাথে আপস করে না; তা যতই প্রলোভনমূলক হোক না কেন। তারা সন্তানদের দেখায় নিজের যোগ্যতা বিকাশের পথ, যাতে তারা মেধার পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পারে।